পেঁচা সংরক্ষণের মাধ্যমে জৈবিক উপায়ে ইঁদুর দমন

অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর -১৭০১।

পেঁচা সংরক্ষণের মাধ্যমে জৈবিক উপায়ে ইঁদুর দমন

রচনায় ও সম্পাদনায়
ড. মোঃ শাহ আলম
ড. আবু তৈয়ব মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান

অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর -১৭০১।

প্রকাশকালঃ
ফেব্রুয়ারী ২০২১

১০০০ কপি

প্রকাশনায়
অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর -১৭০১।
ফোনঃ ০২-৪৯২৭০১৭৪
ইমেইলঃ pso.vert@bari.gov.bd

"Eco-friendly Rodent Management Through Owl Conservation (ID-087)" শীর্ষক Program Based Research Grant (PBRG) উপ-প্রকল্পের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত বুকলেট।

অর্থায়নে : প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)-বিএআরসি
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

মুদ্রণেঃ

DNS Printers & Suppliers
Shop-20, Akhand Tower, Sec-6, Plot-12, Road-1, Block-Kha, Mirpur, Dhaka-1216
Cell : 01715394226,E-mail: dnsjsa@gmail.com, dns_j@yahoo.com

Citation: Alam, M. S. and A.T.M. Hasanuzzaman. 2021. Biological control of rodent through owl conservation (In Bengali). Vertebrate Pest Division, Bangladesh Agricultural Research Institute, Gazipur-1701 Bangladesh. p17

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের কৃষিতে ইঁদুর একটি প্রধান সমস্যা। ইঁদুর দানা ফসলসহ ডাল, তেলবীজ, কন্দাল ফসল, সবজী ও ফলে ইঁদুর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। ইঁদুর গমে প্রায় ১২% এর মতো ক্ষতি করে। মৌসুম ভেদে ধানের প্রায় ২-৪% ক্ষতি ইঁদুর দ্বারা সাধিত হয়। বসতবাড়ীতে আসবাবপত্র, বইপত্র, বিছানাপত্র কাটাকাটি করে। গুদামজাত ফসল, মুরগীর খামারেও এদের ক্ষতি উল্লেখযোগ্য। বৈদ্যুতিক তার কাটাকাটি করে এরা অগ্নিকান্ড ঘটায়। যত্রতত্র গর্ত করে এরা সেচনালা ও পুকুরের ক্ষতি করে। এছাড়া প্লেগসহ প্রায় ৪০ প্রকার রোগের বিস্তার এই ইঁদুর দ্বারাই ঘটে। কার্যকরী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে সাফল্যজনক ভাবে ইঁদুর দমন অত্যন্ত জরুরী। ইঁদুর দমন পদ্ধতি ব্যবহারের পাশাপাশি ইঁদুর খেকো প্রাণীদেরকে প্রকৃতিতে সংরক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে। জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষায় ইঁদুরের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃতিতে ইঁদুরের প্রধান শত্রু পেঁচা, চিল, সাপ, বিড়াল প্রভৃতি। ইঁদুর খেকো প্রাণী পেঁচা সংরক্ষনের মাধ্যমে ইঁদুর দমন করা গেলে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা হবে পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনেও আমরা এগিয়ে যেতে পারব। সেই সাথে কৃষকও স্বল্প খরচে ফসলি জমির ও গোলার শস্য ইঁদুরের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারবে।

প্যাঁচা সংরক্ষণের মাধ্যমে ইঁদুর ব্যবস্থাপনার উপর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পুস্তিকাটি কৃষি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, কৃষিবিজ্ঞানী, সম্প্রসারনবিদ ও কৃষকদের উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি। পুস্তিকাটির প্রকাশনার সাথে জড়িত বিজ্ঞানীদেরকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

(ড. মোঃ নাজিরুল ইসলাম)

পেঁচা সংরক্ষনের মাধ্যমে জৈবিক উপায়ে ইঁদুর দমন

ইঁদুর নামক প্রাণীটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। প্রাণীটি ক্ষুদ্র হলেও এর ক্ষতির ব্যাপকতা অনেক বেশী। এরা যে কোনো খাদ্য খেয়ে বাঁচতে পারে। যে কোনো পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে। অল্প বয়সে বাচ্চা দিতে পারে। ইঁদুরের বিচরণ ক্ষেত্র ফসলের ক্ষেত থেকে শুরু করে বাড়ির শোয়ার ঘর পর্যন্ত সর্বত্র। আর তাই এদের ক্ষতির ক্ষেত্রও অনেক বিস্তৃত। এরা মাঠের ফসল, ফল, শাকসবজি, গুদামজাত শস্য, সংরক্ষিত বীজ, কাপড়-চোপড়, কাগজ, লেপ-তোষক ইত্যাদি কাটাকুটি করে আমাদের প্রচুর ক্ষতি করে। এরা যা খায় তার ৪-৫ গুণ নষ্ট করে। ২০১৩ সালের এক গবেষণা মতে এশিয়ায় ইঁদুর বছরে যা ধান-চাল খেয়ে নষ্ট করে তা ১৮ কোটি

ছবি: মাঠের কালো ইঁদুর

ছবি: মাঠে ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতি

মানুষের এক বছরের খাবারের সমান। আর শুধু বাংলাদেশে ইঁদুর ৫০-৫৪ লাখ লোকের এক বছরের খাবার নষ্ট করে (দৈনিক প্রথম আলো ২২ জুন ২০১৫)। সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রতি বছর ২ হাজার কোটি টাকার শস্য ইঁদুরের পেটে চলে যাচ্ছে। এরা যে শুধুই কাটাকুটি করে আমাদের ক্ষতি করে তাই নয়, এরা মানুষ ও পশুপাখির মধ্যে প্লেগ, জন্ডিস, টাইফয়েড, চর্মরোগ, আমাশয়, জ্বর এবং কৃমিসহ প্রায় ৬০ প্রকার রোগজীবাণুর বাহক ও বিস্তারকারী। বাংলাদেশের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী দমন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে প্রধানত ফাঁদ পেতে ও বিষটোপ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করা হয়। ফাঁদ দিয়ে ইঁদুর দমনের সফলতা আশানুরুপ হয় না। এ ছাড়া বেশী ভাগ ইঁদুর প্রজাতি ফাঁদের প্রতি লাজুকতা দেখায়। বিষটোপ ইকো সিস্টেম নষ্ট করে। ফলে ইঁদুর ছাড়া অন্যান্য উপকারী প্রাণীও ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবন থাকে, আবার অনেক সময় বিষটোপে অনেক অর্থের অপচয় হয়।

ইঁদুর আমাদের বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্যের একটি প্রাণী। জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষা করতে ইঁদুরের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সময়ে সময়ে ইঁদুর ফসল ও কৃষকের প্রধান শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়। জমির শস্য ও গোলার ফসল রক্ষার্থে ইঁদুর দমন করতে হয়। আমরা জানি ইঁদুরের প্রধান শত্রু পেঁচা, চিল, সাপ, বিড়াল প্রভৃতি। পেঁচা দিয়ে জৈবিক উপায়ে ইঁদুর দমন করা গেলে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা পাবে। সেই সাথে কৃষকও স্বল্প খরচে ফসলি জমির ও গোলার শস্য ইঁদুরের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারবে।

ইঁদুর ব্যবস্থাপনায় জৈবিক দমন

এ প্রক্রিয়ায় ইঁদুর ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন জীবিত জীব যেমন পেঁচা, বেজি, বিড়াল, গুঁইসাপ এবং কুকুরের ব্যবহার অপরিসীম। বর্তমানে বেজি বা গুঁইসাপের পরিবেশ বিপন্ন। গুঁইসাপের চামড়া মূল্যবান হওয়ায় অবৈধ শিকারের ফলে এদের সংখ্যাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে ইঁদুর ব্যবস্থাপনায় বিড়াল এবং কুকুরের ব্যবহার অপর্যাপ্ত। কারণ বিড়াল বা কুকুরকে ইঁদুর শিকার করতে হলে দীর্ঘ সময় নিয়ে 'ক্ষেপ' ধরতে বা এমবুশ করতে হয়। ফলে এদের ক্ষেত্রে ইঁদুর ধরার সফলতা কম। এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে যে, পেঁচার খাদ্যাভাসে বা খাদ্য-শিকলে ইঁদুরের দেহাবশেষ সর্বোচ্চ, শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ অর্থাৎ খাদ্য-শিকলের ৯০ ভাগ ইঁদুরের দখলে। শুধু তাই নয়, ইঁদুরের আবাসস্থল খুঁজে পেঁচা শিকার করে বিধায় এর শিকার-সফলতাও অনেক বেশি। একটি প্রাপ্তবয়স্ক লক্ষীপেঁচা প্রতিদিন ৩-৪ টি ইঁদুর ভক্ষন করে কিন্তু যখন বাসায় বাচ্চা থাকে তখন প্রায় প্রতিদিন ২৫ টি ইঁদুর সংগ্রহ করে। কাজেই একটি খুধার্ত পেঁচা পরিবার বৎসরে প্রায় ৩০০০ টি ইঁদুর ভক্ষন করে থাকে। তাছাড়া রাতে ইঁদুর ও পেঁচা দুটোই সক্রিয় হয় বলে মাঠের ইঁদুর ব্যবস্থাপনায় পেঁচার শিকার কৌশল ইঁদুরের নীরব ঘাতক হিসেবে কাজ করে।

পেঁচা

পেঁচা, এক প্রকার নিশাচর শিকারী পাখি। Strigiformes বর্গভূক্ত এই পাখিটির এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০০ টি প্রজাতি টিকে আছে। বেশীরভাগ পেঁচা ছোট ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন ইঁদুর এবং কীটপতঙ্গ শিকার করে, তবে কিছু প্রজাতি মাছও ধরে। পেঁচা উপর থেকে ছোঁ মেরে শিকার ধরতে অভ্যস্ত। শিকার করা ও শিকার ধরে রাখতে এরা বাঁকানো ঠোঁট বা চক্ষু এবং নখর ব্যবহার করে। কুমেরু, গ্রীনল্যান্ড এবং কিছু নিঃসঙ্গ দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীর সব স্থানেই পেঁচা দেখা

ছবি: খয়রা মেছো পেঁচা, লক্ষীপুর

যায় । বাংলাদেশে ১৭টি প্রজাতির পেঁচা পাওয়া যায়, যার মধ্যে ১৫টি স্থায়ী এবং ২টি পরিযায়ী। পেঁচা মূলত নিঃসঙ্গচর। এরা গাছের কোটর, পাহাড় বা পাথরের গর্ত বা পুরনো দালানে থাকে। পেঁচার মাথা বড় মুখমন্ডল চ্যাপ্টা এবং মাথার সম্মুখদিকে চোখ। পেঁচার চোখের চারিদিকে সাধারণত বৃত্তাকারে পালক সাজানো থাকে যাকে ফেসিয়াল ডিস্ক বলে। এদের অক্ষিগোলক সামনের দিকে অগ্রসর থাকায় এরা দ্বিনেত্র দৃষ্টির অধিকারী। পেঁচার, দূরবদ্ধদৃষ্টি আছে ফলে এরা চোখের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে অবস্থিত কোন বস্তু পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় না। এরা এদের ধরা শিকারকে চক্ষু এবং নখরে অবস্থিত বিশেষ এক ধরনের পালক দ্বারা অনুভব করতে পারে। পেঁচা তার মাথাকে একদিকে ১৩৫ ডিগ্রী কোণে ঘোরাতে পারে। তাই দুই দিক মিলে এদের দৃষ্টিসীমা ২৭০ ডিগ্রী। ফলে এরা নিজের কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে দেখতে পায়। পেঁচার শ্রবণশক্তি খুব প্রখর। শুধু শব্দ দ্বারা চালিত হয়ে এরা নিরেট অন্ধকারে শিকার ধরতে পারে। সামান্য মাথা ঘুরালে পেঁচা অনুচ্চ শব্দ যেমন ইঁদুরের শষ্যদানা চিবানোর আওয়াজও শুনতে পায়, এর কারণ হচ্ছে মাথার গড়ন রূপান্তরিত হওয়ার জন্য পেঁচার দুই কানে সামান্য আগে পরে শব্দ পৌঁছায়। এরা বাতাসে উড়ার সময় কোনো রকম শব্দ করে না। পেঁচার ফেসিয়াল ডিস্ক শিকারের করা শব্দকে শ্রবনে সহায়তা করে। অনেক প্রজাতির পেঁচার ফেসিয়াল ডিস্ক অসমভাবে সাজানো থাকে যাতে শিকারের অবস্থান নির্ণয় করা সহজ হয়।

পেঁচার প্রজাতি

এখনও পর্যন্ত যেসব পেঁচার দেখা পাওয়া যায় তাদেরকে দুটো গোত্রে ভাগ করা হয়েছে: সাধারণ পেঁচা বা Strigidae এবং লক্ষ্মীপেঁচা বা Tytonidae। ভিন্ন প্রজাতির পেঁচার ডাক ভিন্ন রকম। ডাকের ভিন্নতা অনুযায়ী বাংলায় বিভিন্ন পেঁচার বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। যেমন: হুতুম পেঁচা *(Bubo bengalensis)*, ভূতুম পেঁচা (*Ketupa zeylonensis*), লক্ষ্মীপেঁচা (*Tyto alba*), খুঁড়ুলে পেঁচা (*Athene brama*), কুপোখ (*Ninox scutulata*), নিমপোখ (*Otus lepiji*) ইত্যাদি। তবে আমাদের দেশে ফসলের ক্ষেতের আশেপাশে গাছগাছালিতে সাধারনত দুই ধরনের পেঁচা বেশী দেখতে পাওয়া যায় যথা- লক্ষীপেঁচা এবং খুঁড়ুলে পেঁচা। নিম্নে এদের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো

লক্ষ্মীপেঁচা

লক্ষ্মীপেঁচা (ইংরেজি: Barn Owl; বৈজ্ঞানিক নাম: *Tyto alba)* এক ধরনের পেঁচা প্রজাতির পক্ষীবিশেষ। মাঝারি থেকে বৃহৎ আকৃতির হয়ে থাকে এ পাখিটি। শরীরের তুলনায় মুখমণ্ডল অনেকাংশেই বড় হয়ে থাকে। লম্বা পাখনা, ফ্যাকাশে ও হৃদয় আকৃতি মুখের গড়ন এবং বর্গাকৃতির লেজ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য শিকারী পাখি যেমন-

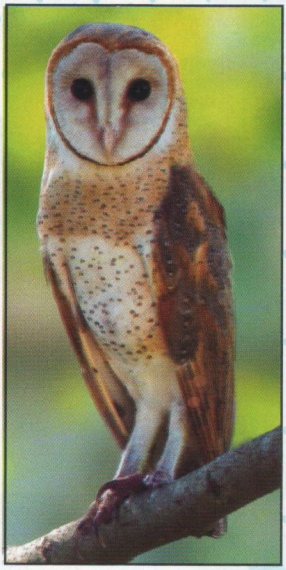

ছবি: লক্ষী পেঁচা, পঞ্চগড়

ঈগল, বাজের ন্যায় এদের লম্বা, শক্তিশালী পায়ের থাবার সাথে সুতীক্ষ্ণ নখর রয়েছে। মূলতঃ গ্রাম এলাকার বিভিন্ন খামার এবং বনভূমিতে এদেরকে দেখা যায় । সাধারণতঃ মাঝারি প্রকৃতির পেঁচা হিসেবে লক্ষীপেঁচার পাখার দৈর্ঘ্য ৭৫-১১০ সেন্টিমিটার। শারীরিক গঠন ২৫-৫০ সেন্টিমিটার বিশিষ্ট। প্রজাতিভেদে ওজন ১৮৭ গ্রাম থেকে ৮০০ গ্রামের মধ্যে হয়ে থাকে। তবে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার লক্ষীপেঁচা তুলনামূলকভাবে কম ওজনের হয়। বসন্ত ঋতুতে এদের প্রজনন মৌসুম। উঁচু গাছের গর্তে এরা বাসা বাঁধে। ছোট ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, মাছ, পোকামাকড়সহ ছোট পাখি শিকার করে জীবনধারণ করে। অধিকাংশ প্রজাতির লক্ষীপেঁচার মাথা এবং শরীরের উর্ধ্বাংশ সচরাচর হাল্কা বাদামী ও হাল্কা রঙের হয়ে থাকে। পালকগুলো বিশেষ করে কপাল ও পিছনের দিকে ঘন ধুসর বর্ণের হয়। হৃদয় আকৃতির মুখাংশটি প্রায়শঃই উজ্জ্বল সাদাটে হলেও কিছু প্রজাতির বাদামী রঙের হয়ে থাকে । নিম্নাংশের পালকগুলো সাদা থেকে লালচে হয়ে থাকে। এছাড়াও কিঞ্চিৎ কালো-বাদামী বর্ণের সংমিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়।

স্বভাব

নিশাচর ও শিকারী পাখি হিসেবে লক্ষীপেঁচার আচরণ অন্যান্য পেঁচার ন্যায়। কিন্তু গোধূলীলগ্নে এটি সক্রিয় হয়ে উঠে। মাঝে মাঝে দিনের বেলায়ও কিঞ্চিৎ দেখা মেলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০০ মিটার উপরে কিংবা ৩০০০ মিটার নিচে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার খামার ও ঘাসপূর্ণ এলাকা, বনভূমিতে এদেরকে দেখা যায়। শিকার নিয়ে কোন কাঠ বা খুঁটির উপরিভাগে বসতে পছন্দ করে। খুবই নিঃশব্দে এদের পদচারণা ঘটে অর্থাৎ আওয়াজবিহীন অবস্থায় এরা উড়তে সক্ষমতা প্রদর্শন করে। এদের শ্রবণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। পেঁচার প্রজনন সময় এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। একটি স্ত্রী পেঁচা ২ থেকে ৫টি ডিম দিয়ে থাকে। ডিমের রং সাদা গোলাকৃতি। আর ১২ থেকে ১৪ দিন ডিমে তা দেবার পর বাচ্চা ফোটে। এরা মরা বাঁশ বা গাছের মাথায় বসতে পছন্দ করে।

ছবি: লক্ষী পেঁচা, গাজীপুর

আর দিনের বেলায় এরা গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। এরা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। বরং ফসল নষ্টকারী প্রাণী, ইঁদুরসহ অন্যান্য প্রাণী শিকার করে থাকে। এছাড়া সাপ, ব্যাঙ ও কীট-পতঙ্গ শিকার করে। পেঁচার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি খুবই প্রখর। এদের দৃষ্টি যেন দূরবিনের মত। রাতের অন্ধকারে দূরের জিনিষ দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখতে পায়। তবে মনে রাখতে হবে পেঁচা কাছের জিনিষ ভালমত দেখতে পায় না। কিন্তু শত্রুর আগমনের আগেই তারা টের পেয়ে যায়। আর মানুষের দৃষ্টিশক্তির থেকে এদের দৃষ্টিশক্তি অনেক বেশী। পেঁচার চওড়া মাথা। পেঁচার চোখ অন্যান্য পাখির মতো মাথার পাশে বসান থাকে না। এদের চোখ আনেকটা মানুষের মতো সামনের দিকে। মাথা ঘুড়াতে পারে প্রায় ২৭০ ডিগ্রি কোণে। এই কারণেই পেঁচা দু'চোখ মেলে তাকালে অনেকে ভয় পায়। প্রাকৃতিকভাবে বালাই ব্যবস্থাপনার জন্য পেঁচার জুড়ি নেই। এদের বাঁচিয়ে রাখা আমাদেরই কর্তব্য।

খুঁড়ুলে পেঁচা

খুঁড়ুলে পেঁচা *(Athene brama)* (ইংরেজিঃ *Spotted Owlet),* খুঁড়ুলে পেঁচা বা কোটরে পেঁচা (Strigidae) গোত্র বা পরিবারের অন্তর্গত ক্ষুদ্রকায় এক প্রজাতির পেঁচা। সাধারণত গাছের কোটরে বা খোঁড়লে এরা বাসা করে বলেই এদের এমন নাম, তবে দালান-কোঠার ফাঁক-ফোকরেও বাসা করতে দেখা যায়। মানব বসতি বা কৃষিভূমির আশেপাশে এদের সাধারণ আবাস, শহরেও এরা নিজেদের রপ্ত করে নিয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে এদের সংখ্যা কমে গেলেও আশঙ্কাজনক পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছায়নি।

ছবিঃ খুঁড়ুলে পেঁচা, রংপুর

বিস্তৃতি

খুঁড়ুলে পেঁচার আবাস মূলত এশিয়ার গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে। ঠিক করে বললে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, পাকিস্থান, নেপাল, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ও লাওস। ইরানের দক্ষিণাঞ্চলেও এদের দেখা যায়। এ প্রজাতিটি শ্রীলঙ্কায় নেই, তবে পক প্রণালীর আশেপাশে শ্রীলঙ্কার উপকূলে এদের দেখা যায়।

ছবিঃ খুঁড়ুলে পেঁচা, গাজীপুর

বিবরণ

নাদুস-নুদুস দেখতে এ ছোট পেঁচার চোখের চারিদিক ও গলা সাদা। চোখের তারা ফ্যাকাশে থেকে সোনালি হলুদ। শরীরের তুলনায় মুখ ছোট। পিঠের দিক গাঢ় বাদামী, তার উপর বহু সাদা ফোঁটা থাকে। মাথার উপরের ফোঁটাগুলো ছোট আকারের। সাদাটে পেটের দিকে আনুভূমিক বাদামী রেখা দেখা যায়। বাদামী লেজে চিকন সাদা বলয় আছে। ঠোঁট সবুজ, পা ও পায়ের পাতা অনুজ্জ্বল হলদে-সবুজ। স্ত্রী ও পুরুষ দেখতে অভিন্ন। দৈর্ঘ্যে কমবেশি ২৩ সেন্টিমিটার।

আচরণ

জোড়ায় জোড়ায় থাকে এবং এক জোড়া একই জায়গায় থাকতে পছন্দ করে। মাঝেমাঝে পারিবারিক দলেও থাকে। গোধূলি এবং কাকডাকা ভোরে এরা বেশি কর্মচঞ্চল থাকে। সন্ধ্যায় বেশ জোরের সাথে প্রজাতি আপেক্ষিক ডাক চিকিক-চিকিক-চিকিক ইত্যাদি শব্দ করে তাদের কাজ শুরু করে। খুঁড়ুলে পেঁচা নিশাচর। রাতভর শিকার করে। প্রত্যেকটি জোড়ার নির্দিষ্ট বসতি সীমানার (territory) পরিচিত গাছের ফোকর, বড় ডালের গোড়ার আবডাল, অব্যবহৃত বাড়িঘর, দালান-কোঠার ফাঁক-ফোকরে দিন কাটায়, তবে সুযোগ পেলে দিনে দু'-একবার রোদ পোহায় ও শত্রু পর্যবেক্ষণ করে। বাদলা দিনের সকালে বা বিকালে খাবার ধরার জন্য বের হতে পারে। এরা দিনের প্রহরে দু'-একবার ডাকলেও রাতের প্রায় সব প্রহরেই ডাকে এবং অনেকসময় অন্য পাখিদের সাথেও যোগ দিয়ে ডাকতে পারে। দিনের বেলায় এ পেঁচার দর্শন পেলে এদের দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু-নিচু করলে ওরাও সুন্দর ভঙ্গিতে ওদের মাথা উঁচু-নিচু করে। গ্রামের কিশোরদের কাছে এটি এক মজার খেলা। মূলত দর্শনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এরা এমনটা করে।

খাদ্যাভ্যাস

খাদ্যাভ্যাস খুঁড়ুলে পেঁচা মাংসাশী শিকারী পাখি। ইঁদুর আর ছুঁচো এদের প্রধান শিকার। এছাড়া খাদ্য তালিকায় আছে উড়ন্ত পোকা, টিকটিকি, বাদুড়, ছোট পাখি ও ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা মূলত ঠোঁট দিয়ে শিকার করে, ঠোঁট দিয়ে শিকারের ঘাড় ভেঙে দেয়। নখ মৃত শিকার ধরার কাজে ব্যবহার করে। পুরো শিকার একবারে গিলে খায়। শিকারের হজম না হওয়া অংশ, যেমন হাড় ও লোম এরা দলা আকারে উগরে দেয়, ইংরেজিতে একে পিলেট বলে।

প্রজনন

এদের প্রজনন মৌসুম নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। প্রজনন মৌসুমে ছোট মাথা এবং চকচকে লেজ দেখে স্ত্রী পেঁচাকে চেনা যায়। এদের বাসা বাঁধার উপাদানগুলোর মধ্যে থাকে শুকনো পাতা, পালক ও খড়কুটো। একসঙ্গে তিন থেকে চারটি ডিম দেয় কোটরে পেঁচা। গোলাকার ডিমগুলো হয় সাদা রঙের। ২৫ দিনে ডিম ফোটে। ৩০ দিনে ছানাদের গায়ে পালক গজায়।

পেঁচার শিকার কৌশল

লক্ষী পেঁচা খুবই দক্ষ শিকারী পাখি। ইঁদুর ও অন্যান্য ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীর অবস্থান ও শিকার দক্ষভাবে ধরতে পারে। লক্ষীপেঁচা শিকারের উদ্দেশ্যে উড়ার সময় ধীর গতি এবং মথের মত দোদুল্যমান উড়ন্ত অবস্থা সম্পুর্ন শব্দহীনভাবে উড়তে পারে যা তাদের উপস্থিতি ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী বুঝতে পারে না ফলে পেঁচা তাদের শিকার ভালভাবে খুজতে না ফলে পেঁচা তাদের শিকার ভালভাবে খুজতে পারে এমনকি সুক্ষ খচমচে শব্দও তারা সনাক্ত করতে পারে। অন্যান্য পাখির চেয়ে পেঁচার হালকা শরীর এবং অনেক লম্বা পাখা এবং তাদের পাখার ওজন খুবই কম যার জন্য ধীরে এবং নিঃশব্দে অনেক নীচ দিয়ে বেশী সময় ধরে উড়তে পারে। পেঁচার পাখা খুবই মসৃন এবং পাখার প্রান্তে একসারি অতি সূক্ষ হুকআকৃতির গঠন যা বাতাসকে আটকে রাখে যার জন্য পাখার কোন শব্দ হয় না। পাখার এই বিশেষ গঠনের জন্য এরা কম প্ররিশ্রমে বেশী জায়গা নিয়ে বেশী সময় ধরে নিঃশব্দে উড়তে পরে বিধায় এদের শিকার ধরা সহজ হয়। পেঁচার ঘাড়ের হাড় S আকৃতির যার জন্য পেঁচা তার মাথাকে একদিকে ১৩৫ ডিগ্রী কোণে ঘোরাতে পারে। তাই দুই দিক মিলে এদের দৃষ্টিসীমা ২৭০ ডিগ্রী। ফলে এরা নিজের কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে দেখতে পায়।

ছবি: লক্ষী পেঁচার দোদুল্যমান উড়ন্ত অবস্থা

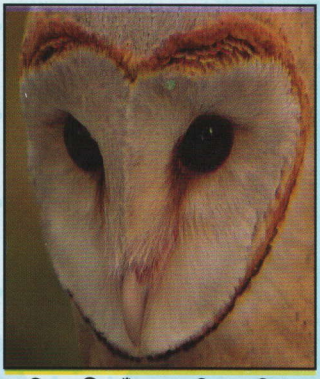

ছবি: লক্ষী পেঁচার ফেসিয়াল ডিস্ক

এদের আছে বিশেষভাবে অভিযোজিত চক্ষু যা তুলনামূলক ভাবে ছোট এবং কালো কিন্তু দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর, অন্ধকারেও পেঁচা যে কোন বস্তু স্পষ্ট দেখতে পারে। এমনকি বিশেষভাবে অন্ধকারে অভিযোজিত চক্ষু দিনের বেলাও মানুষের চেয়ে স্পষ্ট দেখতে পায়। অন্যটি হলো কানের ত্রিমাত্রিক শ্রবণ। পেঁচার মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশ ত্রিমাত্রিকভাবে শোনার জন্য কাজ করে। এর ফলে সৃষ্ট শব্দ এবং তার অবস্থান, অন্য যে কোনো পাখির তুলনায় এরা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। বিশেষ পালক দিয়ে তৈরী পেঁচার চেপ্টা ও হৃদপিন্ডাকৃতির মুখের গঠন যাকে ফেসিয়াল ডিস্ক বলা হয় । এই ফেসিয়াল ডিস্ক স্যাটেলাইট ডিসের

মত রাডারের কাজ করে। ফলে পেঁচার কানে আসা শব্দটির উৎপত্তি এবং দিক নির্ণয় করতে পারে। পেঁচা তার বিশেষ ধরনের মাংসপেশির সাহায্যে ডিস্কের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। ফলে ইঁদুরজাতীয় প্রাণী কর্তৃক সৃষ্ট কিচিরমিচির বা অন্য যে কোনো শব্দের শব্দতরঙ্গের অবস্থান অন্ধকারের মধ্যে প্রায় ৩০ মিটার দূর হতে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারে। কানে শব্দ পৌঁছার সাথে সাথে পেঁচা সেদিকেই দৃষ্টি ফেরায়, ফলে শিকারটি মাথার সামনের দিকে অবস্থান করে বিধায় পেঁচার সহজেই শিকার ধরতে পারে । রাতে বিচরণকারী অন্যান্য পেঁচার তুলনায়, লক্ষী পেঁচার দুই কানেই এক সেট করে উন্নত অংশ রয়েছে, যার খোলা স্থানটি ভিন্ন ভিন্ন কোণে থাকায় ইঁদুর কর্তৃক উৎপন্ন উচ্চ বা নিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে কোনো শব্দ, তা কোন দিক থেকে (ডান-বাম-ওপর-নিচ) এবং কতদূর থেকে আসছে লক্ষীপেঁচা তা সঠিকভাবে ঘুটঘটে অন্ধকারের মধ্যেও নির্ণয় করতে পারে। এই জন্য ফসল ও ঝোপঝারের ভিতর দিয়ে ইঁদুরের চলাচল, খাবার চিবানোর শব্দ পেঁচা শুনতে পারে। বিশেষভাবে অভিযোজিত শ্রবন শক্তি দিয়ে এরা দিনের বেলা এমনকি ঘন ফসলের ও ঝোপঝাড়ের ভিতরও শিকার ধরতে সক্ষম।

পেঁচার বিশেষায়িত লম্বা পা, তীক্ষ্ম ও শক্তিশালী নখর বা টেলন যা গভীর ফসলী জমির ভিতরে শিকার ধরতে সক্ষম। নখর বা টেলন খুবই তীক্ষ্ম যার মাধ্যমে শিকার দৃঢ়মুষ্টিতে আকড়িয়ে ধরে ঠোটের সাহায্য ছাড়াই মেরে ফেলতে পারে। অন্যান্য পাখির মত পেঁচার পাখা পানিরোধী (water proof) নয়। এই জন্য পেঁচা সাধারনতঃ বৃষ্টির সময় এবং শীতে শিকার ধরা এড়িয়ে চলে, কারন পালক ভিজে গেলে শব্দ হয় এবং শিকার ধরার সক্ষমতা কমে যায়।

ছবি: লক্ষী পেঁচার পায়ের গঠন

পেঁচার বিচরণ এলাকা

পেঁচার বিচরণ কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণত এরা যখন যেখানে বা যে এলাকায় থাকে সেখানকার নেস্ট বক্স (Nest box) ব্যবহার করে। এরা ডজন ডজন বা কলোনি করে গ্রুপে কোনো এলাকায় থাকতে পছন্দ করে। সেজন্য বলা হয় যে, কোনো ফার্মে/এলাকায় একটি পেঁচা রাখার চেয়ে

ছবি: মাঠে স্থাপিত পর্যবেক্ষণ টাওয়ার

কলোনি আকারে সংরক্ষণ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কারণ বড় এলাকা নিয়ে তখন এরা শিকার কার্যক্রম চালায়। শিকারের সন্ধানে এরা ৩-৪ কিমি. পর্যন্ত উড়তে পারে। এভাবে Barn Owl-এর একটি কলোনি কোনো এলাকার ইঁদুরের আক্রমণকে দারুণভাবে কমিয়ে দিতে পারে। এরা আক্রান্ত এলাকার সব ইঁদুরকে দমন করতে পারে না। এভাবে পেঁচা সব ইঁদুর ধ্বংস না করে ভারসাম্য অবস্থায় ইঁদুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত অনুপাতে সংরক্ষণ করে এবং প্রকৃতিতে ভারসাম্য বজায় রাখে।

পৃথিবীর সর্বত্রই পেঁচাজাতীয় প্রাণীকে বিভিন্ন ধরনের আবাসস্থলে বিশেষ করে যেখানে ইঁদুরজাতীয় প্রাণীদের অবস্থান সেখানেই দেখতে পাওয়া যায়। তাই উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের কৃষক মাঠ ফসলের ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের জন্য পেঁচাকে ব্যবহার করছে। পেঁচার বসবাসকে উৎসাহিত করার জন্য কৃষকের জমিতে পেঁচার ঘর (Nest-box) এবং রাতে পেঁচা বসার জন্য টাওয়ারের ব্যবস্থা করছে এবং কাংক্ষিত মাত্রার সুফলও পাওয়া যাচ্ছে।

ছবি: পর্যবেক্ষণ টাওয়ার

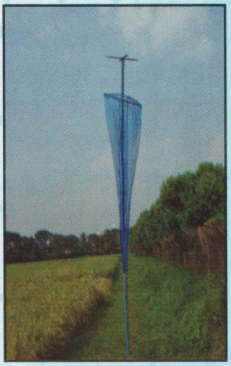

ছবি: পেঁচার পিলেট

এরই আলোকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ মাঠ ফসলের গম, বার্লি, আলু, মিস্টি আলু বিভিন্ন সবজী ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য গবেষণা প্লটের ওপর দিয়ে ৫০ মিটার পরপর ১০-১২ ফিট উচ্চতায় পর্যবেক্ষণ টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। এতে রাতে পেঁচা বসে এবং খুঁটিকে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার (Watch Tower) হিসেবে ব্যবহার করে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে রাতে পেঁচা বসে মাঠের ইঁদুর নীরবে নিঃশব্দে ধরে খায়। এরা ৮০ থেকে ১০০ গ্রাম ওজনের ইঁদুর বেশি পছন্দ করে। কারণ পেঁচা আস্তঃপুরো ইঁদুরটি গিলে ফেলতে বেশি আগ্রহী, তবে শিকারকৃত ইঁদুরের আকার বা তার ওজন বেশি হলে এরা প্রথমে ইঁদুরের মাথা এবং পরে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। ইঁদুরের হাড়, পশম, মাথার খুলি ইত্যাদি হজম হয় না। শিকার ধরার আগে পেঁচা এর আগে গৃহীত বা ভক্ষণকৃত ইঁদুরের অপাচিত

ছবি: পিলেটে ইঁদুরের হাড় ও অন্যান্য অংশ

অংশগুলো পিলেট (Pellet) আকারে বমি (Regurgitated) করে। বমিকৃত পিলেট সংগ্রহ করে শুকিয়ে নিয়ে ৮% নরমাল NaOH দ্রবণে ভিজালে ইঁদুরের চামড়া, হাড় এবং মাথার খুলি পৃথক হয় এবং খাওয়া ইঁদুর বা ইঁদুর প্রজাতির শনাক্তকরণ সম্ভব হয়। পিলেট বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে পেঁচার খাবারের ৮০-৯০ শতাংশই

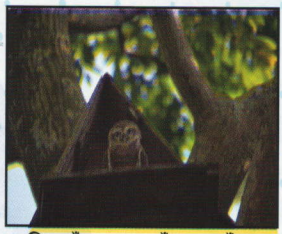

ছবি: পেঁচার ঘরে খুঁড়ুলে পেঁচা

ছবি: পেঁচার ঘর

ইঁদুর ও চিঁকার হাড়, পশম ও মাথার খুলি এবং এতে বুঝা যায় যে পেঁচার প্রধান খাবার হলো ইঁদুর, সলুই, চিঁকা ইত্যাদি। তাই জৈব পদ্ধতির অংশ হিসেবে পেঁচা লালন-পালন বা প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে ইঁদুর ব্যবস্থাপনা করা যায়। আমাদের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার (Watch Tower) স্থাপনকৃত এলাকার আশেপাশে ইঁদুরের সতেজ গর্ত (active burrows) ও ফসলের ক্ষতির পরিমান পর্যবেক্ষণ টাওয়ার (Watch Tower) বিহীন এলাকা হতে প্রায় ৭৫ শকাংশ কম। গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ এর তত্বাবধানে PIU-BARC, NATP-2, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা এর আর্থিক সহায়তায় স্থাপনকৃত পেঁচার ঘরের (Nest box) প্রায় ৫০ শতাশেং পেঁচা বসতি স্থাপন শুরু করেছে। আমরা আশা করছি ভবিষ্যতে আস্তে আস্তে পেঁচার সংখা আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই জৈব পদ্ধতির অংশ হিসেবে পেঁচা লালন- পালন বা প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে ইঁদুর ব্যাবস্থাপনা বা ফসলের ক্ষতির পরিমান কমানো সম্ভব হবে।

পেঁচা কমে যাওয়ার কারন

বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পেঁচার সংখ্যা কমে যাচ্ছে তার প্রধান কারন হল পেঁচার অস্বাভাবিক মৃত্যু ও প্রজননের সুযোগ সুবিধা হ্রাস পাওয়া।

১। আবাসস্থল হারানো

পেঁচা সাধারন উঁচু গাছ, পুরাতন দালান কোটা, ঝোপালো গাছের কোটরে বাস করে। আমদের দেশে গাছপালা নিধনের কারনে দিনদিন পেঁচার আবাস্থল কমে যাচ্ছে।

২। ইঁদুর নাশকের যত্রতত্র ব্যবহার

কৃষির নিবিরতা ও প্রসারতা বৃদ্ধির ফলে রাসায়নিক দ্রব্যাদি যেমন- সার, কীটনাশক, ইঁদুরনাশক এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দীর্ঘ দিনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে লক্ষীপেঁচার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। মানুষের অসচেতনতার কারনে মৃত বা বিষটোপ খাওয়া

ছবি: সেকেন্ডারী বিষক্রিয়ায় মৃত পেঁচা

ইঁদুর যেখানে সেখানে উন্মুক্ত স্থানে পরে থাকে। পেঁচা এই সব ইঁদুর খেলে পেঁচাও মারা যায়। শুধু পেঁচাই নয় অন্যান্য ইঁদুর ভোগী প্রাণীও মারা যায়। যার জন্য পেঁচার সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

৩। পেঁচার বাসা ও বিশ্রামের স্থান কমে যাওয়া

পেঁচার উপযুক্ত বাসা তৈরীর স্থান ও বাচ্চা লালন পালনের স্থান দিনদিন কমে যাচ্ছে। পেঁচার চাহনী ও তার মুখাকৃতি দেখে মানুষ ভয় পায়। ফলে পেঁচার বাসা বা বাচ্চা দেখলে মানুষের অজ্ঞানতার জন্য বাসা ভেঙ্গে ফেলে এবং বাচ্চা মেরে ফেলে। ফলে তাদের প্রজননের সুযোগ কমে যাচ্ছে। আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের আবাস্থল বৃদ্ধির জন্য গাছপালা কেটে বাসাবাড়ী তৈরী, যোগাযোগের জন্য সড়ক তৈরী, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সংখ্যা কমে যাওয়া ইত্যাদি কারনে পেঁচার সংখ্যা দিনদিন কমে যাচ্ছে। The Breeding Birds atlas (২০০০-২০১১) এর হিসাব মতে পাখির প্রজননের ব্যাপ্তি গত ৪০ বৎসরে ৩৯% কমেছে। আমাদের দেশেও পেঁচার সংখ্যা গত ২৫ বৎসরে ৫০% কমেছে। আমাদের দেশে ও পেঁচার প্রজনন ব্যপ্তি কমে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে লক্ষী পেঁচাসহ ২৬ টি পাখির প্রজাতিকে Redlist এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, এবং এদেরকে সংরক্ষণের অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নত করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণ করে পেঁচার সংখ্যা বৃদ্ধির উপায়

পেঁচা পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পেঁচা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও ফুডচেইন এর গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। পরিবেশে তাদের সংরক্ষণ করা আমাদের দ্বায়িত্ব। নির্বিচারে বড় বড় গাছ না কেটে এগুলো সংরক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে শুধু পেঁচাই নয় অন্যান্য পাখি ও বন্যপ্রাণীর আবাস্থল হিসাবে ভূমিকা রাখবে।

১। ইঁদুরনাশকের অনাবৃত্ত অবস্থায় ব্যবহার কমাতে হবে;

গ্রামে এবং শহরে ইঁদুর দমনের জন্য বিষটোপ ব্যবহার করা হয় যা পরিবেশের এবং পেঁচার জন্য হুমকিস্বরুপ। ইঁদুরনাশক খুবই বিষাক্ত এর ফলে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিষ ব্যবহারের ফলে ইঁদুর মারা যায় এই মৃত ইঁদুর খেয়ে অন্যান্য ইঁদুর ভোজী প্রাণী যেমন সাপ, বেজী, বাজপাখী, শিয়াল, গুইসাপ, পেঁচা মারা যায় একে সেকেন্ডারী বিষক্রিয়া বলে। ইঁদুরনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হতে হবে। যেমন

ছবি: ইঁদুরনাশকে মৃত অনাবৃত ইঁদুর

ক. ইঁদুর নাশক ব্যবহারের ফলে মারা যাওয়া ইঁদুর যেখানে সেখানে না ফেলে গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।

খ. উন্মুক্ত স্থানে ইঁদুর নাশক ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। গর্তের ইঁদুর দমনের ক্ষেত্রে গর্তের ভিতর বিষটোপ ব্যবহার করতে হবে যাতে ইঁদুর বিষটোপ খেয়ে গর্তের ভিতর মারা যায়। এতে সেকেন্ডারী বিষক্রিয়া এর সংখ্যা অনেক কমে যাবে। ফলে ইঁদুরনাশকে মৃত ইঁদুর, ইঁদুরভোজী প্রাণীর সংস্পর্শে আসবেনা এবং ফলে পরিবেশ দূষন কম হবে ও পেঁচা সংরক্ষনের সহায়তা হবে।

২। সংরক্ষনের পরিবেশ সৃষ্টি করা

পেঁচার আবাস্থল, প্রজনন পরিবেশ কমে যাচ্ছে। তাদের আবাস্থল বৃদ্ধি করার জন্য পেঁচার নেষ্ট বক্স তৈরী করে দিলে পেঁচা সেখানে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং প্রজননের পরিবেশ তৈরী হবে। মাঠে পেঁচা বসে তার শিকার ধরার জন্য পর্যবেক্ষন টাওয়ার (watch tower) স্থাপন করে দিলে পেঁচা রাতে পর্যবেক্ষন টাওয়ারে বসে শিকারের স্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারবে এবং শিকার ধরতে অনেক সহজ হবে। পর্যবেক্ষন টাওয়ার যে শুধু পেঁচা বসার স্থান তা নয় দিনের বেলা বিভিন্ন পাখি যেমন-ফিঙ্গে, শালিক ইত্যাদি বসে পোঁকামাকড় ধরতে পারবে। একে Smart tower ও বলা যেতে পারে। এই দিয়ে দিনের বেলা পাখি ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় খাবে এবং রাতের বেলা পেঁচা ইঁদুর শিকারের জন্য ব্যবহার করবে। আমাদের গবেষনায় দেখা গিয়েছে যে পর্যবেক্ষন টাওয়ারের আশেপাশে ইঁদুরের দ্বারা ফসলের ক্ষতির পরিমান ও ইঁদুরের সতেজ গর্তের সংখ্যা পর্যবেক্ষন টাওয়ার বিহীন এলাকা হতে অনেক কম। পর্যবেক্ষন টাওয়ার ব্যবহার করে প্রাকৃতিক উপায়ে ইঁদুর দমন করা অনেক সহজ হবে এবং বিপুল অর্থ সম্পদ সংরক্ষণ হবে। মাঠে প্রতি ৫০ মিটার দুরে একটি করে পর্যবেক্ষন টাওয়ার ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে এবং খরচও অনেক কম হবে। পেঁচার ঘর (Nest box) ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ একর জায়গার জন্য একটি পেঁচার ঘর স্থাপন করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে এবং পর্যবেক্ষনে দেখা গেছে যে ৪৮ টি পেঁচার ঘর এ বসবাসকারী পেঁচা গুলো ৮ সপ্তাহে প্রায় ১৭০০ ইঁদুর বা ইঁদুর জাতীয় প্রাণী মারতে সক্ষম হয়েছে। শিকারের সন্ধানে পেঁচা ৩-৪ কিমি.পর্যন্ত উড়তে পারে।

৩। পেঁচা সংরক্ষনে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে

পেঁচা সম্বন্ধে বিভিন্ন পৌরানিক কাহিনী ও লোকমুখে অনেক ভ্রান্ত ধারনা আছে। বাংলাদেশ সহ সারাবিশ্বে লোকমুখে পেঁচা সম্বন্ধে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারনা পাওয়া যায়। পেঁচার অদ্ভুত রকমের ডাক এবং নিশাচর স্বভাব একে নানা কুসংস্কার এবং অলৌকিক চিন্তার সাথে যুক্ত করেছে। কোন কোন সমাজে পেঁচাকে শুভ প্রতীক বলে মনে করা হয়। অনেক সম্প্রদায় যেমন-মান্দি, হাজং, গারোদের কাছে পেঁচা অনেকটা পূজনীয় পাখি। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে লক্ষ্মী পেঁচাকে শুভ শক্তির প্রতীক হিসেবেই দেখা হয়। অনেকে এ পাখিকে অশুভ প্রতীক বলে মনে করেন। আবার কোন কোন সমাজে অভিসাপ, ডাইনি ও শয়তান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। কেনিয়ার কিকুযু উপজাতিগোষ্ঠী বিশ্বাস করে যে, পেঁচা মৃত্যুর আগমনের কথা জানিয়ে দেয়। যদি কেউ একটি পেঁচা দেখে কিংবা তার আওয়াজ শোনে তাহলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। প্রচলিত বিশ্বাসবোধে পেঁচাকে মন্দ ভাগ্য, শারীরিক অসুস্থতা অথবা মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এই বিশ্বাস অদ্যাবধি প্রচলিত রয়েছে। কোনো কোনো সমাজে পেঁচার ডাক শুনতে পেলে বাড়ির সিঁড়িতে পানি ঢেলে দেওয়া হয়। মনে করা হয়, এতে পেঁচার অশুভ প্রভাব থেকে বাড়ি সুরক্ষিত থাকে। সমাজে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারনার জন্য পেঁচা দেখলে অথবা পেঁচার বাসা ও বাচ্চা দেখলে মেরে ফেলে। কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশে যেভাবে পেঁচা দেখা যেতো এখন আর তেমন দেখা যায় না। দিন দিন আমাদের দেশে পেঁচার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কীট-পতঙ্গ, সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর পেঁচার খাদ্য। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পেঁচার ভূমিকা অতুলনীয়। পেঁচা পাখিদের দলের হলেও এরা

অন্যান্য পাখিদের সাথে একত্রে থাকে না। এরা একাকী নির্জনে বাস করে। এরা নিশাচর। বস্তুত পেঁচা একটি অতি উপকারী পাখি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পেঁচার ভূমিকা অতুলনীয়। নিশাচর পাখি হওয়ায় শিকারের জন্য রাতের বেলায় ঘুড়ে বেড়ায় স্বাধীনভাবে। লক্ষীপেঁচা ও খুঁড়ুলে পেঁচা ছাড়া অন্য প্রজাতির পেঁচা লোকারন্যে খুব বেশী দেখা যায় না। ফসল প্রধান এলাকায় বেশী বসবাস করে লক্ষীপেঁচা ও খুঁড়ুলে পেঁচা। কৃষকের মাঠের ফসল নষ্টকারী ইঁদুর ভক্ষন করে থাকে এই পেঁচা অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে বালাই ব্যবস্থাপনা (Pest Management) করে থাকে এই পেঁচা। এদের দিনের আলোতে খুব একটা বেশী দেখা যায় না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পেঁচা বড় বড় গাছের কোটরে, বন-জঙ্গল, দালানের ফাঁকফোকরে কিংবা উঁচু গাছের মগডালে বা ঘনপাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। পাখি বিশারদরা মনে করেন নির্বিচারে বৃক্ষ উজাড়, ফসল আবাদ করতে জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, শিকারিদের দৌরাত্ম্য খাদ্যের আভাব, অশুভ পাখি বলে মেরে ফেলাসহ বিভিন্ন কারনে প্রকৃতি থেকে পেঁচার সংখা কমে যাচ্ছে। আমরা যদি পেঁচার আবাসস্থল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গাছে ও দালানে পেঁচার ঘর (Nest box) স্থাপন করে দি তাহলে পেঁচার আবাসস্থলের সুযোগ হবে এবং পেঁচার সংখা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে। অপরদিকে মাঠে যদি পর্যবেক্ষন টাওয়ার (watch tower) স্থাপন করে দিলে পেঁচা বসে মাঠের ইঁদুর সন্ধান করতে এবং শিকার ধরতে পারবে। পেঁচা ব্যবহারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পেঁচার জীবন-বৃত্তান্ত এবং তার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার তথ্যাদি লিফলেট, বুকলেট বা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জ্ঞাত করা যে পেঁচা আমাদের কোন ক্ষতি করে না বরং এরা জমির ইঁদুর ও কীটপতঙ্গ খেয়ে ফসল রক্ষা করে থাকে। এ কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পেঁচার খাদ্যাভাসে বা খাদ্য-শিকলে ইঁদুরের দেহাবশেষ সর্বোচ্চ, শতকরা প্রায় ৮০ - ৯০ ভাগ। রাতে ইঁদুর ও পেঁচা দুটিই সক্রিয় হয় এবং পেঁচা ইঁদুরের আবাসস্থল খুঁজে শিকার করে। তাই এর শিকার-সফলতা অনান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি। মাঠের ইঁদুর ব্যবস্থাপনায় পেঁচা নীরব ঘাতক হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার

ইঁদুর দমনে কোন একক পদ্ধতি সব জায়গার জন্য কার্যকর নয় এমনকি আদর্শ অবস্থায়ও উপযুক্ত নয়। কাজেই ইঁদুর দমনের জন্য সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনাই যুক্তিযুক্ত। পেঁচা সংরক্ষণের মাধ্যমে জৈবিক উপায়ে ইঁদুর দমন একটি সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার একটি উপাদান। আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে পেঁচার সংখা দিন দিন কমে যাচ্ছে কারণ পেঁচার আবাসস্থল কমে যাচ্ছে। পেঁচার আবাসস্থল বৃদ্দির জন্য বিভিন্ন স্থানে পেঁচার বাক্স (Nest box) স্থাপন করতে হবে, এতে পেঁচার বাসস্থান ও প্রজননের সূযোগ সৃষ্টি হবে। ফসলি জমিতে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার (Watch Tower) স্থাপন করতে হবে এতে পেঁচা বসে রাতে শিকার অনুসন্ধান করতে ও শিকার ধরতে পারবে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে মাঠ ফসলের ইঁদুর ব্যবস্থাপনা হবে দূষণমুক্ত ও পরিবেশসম্মত, সাশ্রয়ী হবে কৃষি উৎপাদন এবং বিপুল অর্থসম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১। The Barn Owl Trust: Conserving the Barn owl and its Environment, Link: www.barnowltrust.org.uk

২। Birds Bangladesh, link: https://www.facebook.com /groups/2403154788

৩। BIRDS & WILDLIFE OF BANGLADESH, link: https://www.facebook.com/groups/906623289387542

৪। উইকিপিডিয়া, একটি মুক্ত বিশ্বকোষ।, https://bn.wikipedia.org /wiki/পেঁচা

৫। Zaman, M.M. 2011. Link: https://www.facebook.com/MMZRajib/photos.

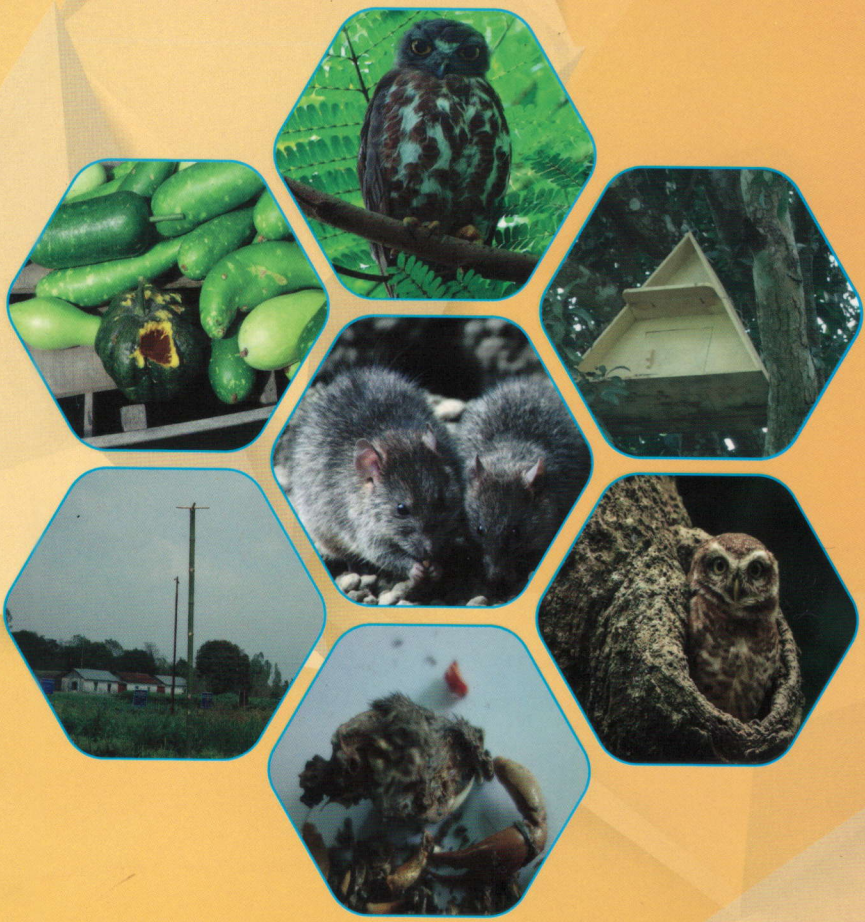

অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর -১৭০১।